International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-I, January 2022, Page No. 16-37
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i1.2022.16-37

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের গণবিচ্ছিন্নতা : একটি পর্যালোচনা

মরিয়ম জামিলা
স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

Abstract

Political Party is an inevitable part of politics. People participates in political activities as a political animal and it is possible through political parties. On the other hand public opinion that is closely related to the political party. Public opinion is the main voo of the democratic government. This is an important element to counter the dictatorship. But now, looking at all the major political parties in Bangladesh, it is seen that they are being separated from the public. At present, the confidence and trust of the public is being lost to the political parties. That's why political parties do not want, to call the rally in a procession. People are hired by the people to rent, and at present, the participation of the people in the election process is also reduced. People are turning their faces away from political parties, which means that the political parties that work in connection with the government and the people of the country due to the absence of communalism are making the country a failed state. As a result, the democratic government in the country is becoming undemocratic government day by day. In order to bring about a balance in politics, it is necessary to bring an healthy atmosphere within the political parties, Professional organizations, constitutional institutions.But the most urgent need for democracy is the closeness of democratic mentality or relations with the people. And as a result, it would be possible to eliminate the hostile attitude of the political parties.

ভূমিকা: দল ব্যবস্থা বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। কার্যত রাজনৈতিক দলের সাহায্যেই দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এটা জনমত গঠনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। রাজনৈতিক দল দেশের নির্বাচকমন্ডলী এবং সরকারের মধ্যে এক অপরিহার্য সেতুবন্ধন স্বরূপ অবস্থান করে। এজন্য দল ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রের প্রাণ স্বরূপ কল্পনা করা যায়। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা বা ভূমিকা অনস্বীকার্য। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র অচল আবার এই গণতন্ত্র রক্ষিত হয় যখন রাজনৈতিক দলগুলোকে জনগণ সমর্থন জানায় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে একাত্ব হয়ে জনগণ কাজ করে। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, জনগণ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আগের সময়কার মতো একাত্ম হয়ে কাজ করতে নারাজ। জনগণ রাজনৈতিক দলগুলোর দূর্নীতি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং স্বার্থের রাজনীতিকে এখন পছন্দ করে না। ফলে জনগণ ১৯৫২, ১৯৫৯, ১৯৭১ সালের মত এখন আর মিছিল,

মিটিং এমনকি নির্বাচনেও কম অংশগ্রহণ করে ফলে চলে টাকার রাজনীতি। এর ফলে দিন দিন বাড়ছে বা ঘটছে গণবিচ্ছিন্নতা। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেষ মুজিবুর রহমানের এক ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণেই যেমন বাঙালী জাতি **১৯৭১** সালের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল আর এর বদৌলতেই আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু বর্তমান সময়ে তা কল্পনা করা যায় না। এর মূল কারণই হল জনগণের রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে গণবিচ্ছিন্নতা।

গবেষণা পদ্ধতি

- **চলক নির্ধারণ:** এই গবেষণায় স্বাধীন চলক হচ্ছে "রাজনৈতিক দল" এবং নির্ভরশীল চলক হচ্ছে "গণবিচ্ছিন্নতা" ।
- **ধারণার কার্যকরী সঙ্গায়ন:** বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে চলক নির্ধারণ ও ধারণার কার্যকরী সঙ্গায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে গবেষণা কর্মের প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের সঙ্গা নিম্নে দেওয়া হল:

ক) রাজনৈতিক দল: রাজনৈতিক দল বলতে এমন এক গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে যা মোটামুটিভাবে সুসংগঠিত, একটি রাজনৈতিক ইউনিট হিসেবে কাজ করে, যা ভোট প্রদান ক্ষমতার মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রন করতে চায় এবং সাধারন নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করার মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতা অর্জনের জন্য তৎপর থাকে।

খ) গণবিচ্ছিন্নতা: গণবিচ্ছিন্নতা এমন একটি বিষয় বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বুঝা যায় রাজনৈতিক দল সমূহের কর্মকান্ড ইতিবাচক না নেতিবাচক। কারণ গণবিচ্ছিন্নতা তখনই ঘটে যখন রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে যায়, জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে পূরণ করে না, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকান্ড, গুম,মানবাধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সংকোচন, দূর্নীতিতে লিপ্ত হয় এবং শুধু নিজের প্রয়োজনে রাজনীতি করে আর তখনই দেখা দেয় গণবিচ্ছিন্নতা। গণবিচ্ছিন্নতার ফলে জনগণ রাজনীতি থেকে দূরে সরে যায় এবং রাজনীতি, রাজনৈতিক ইতিহাস-ঐতিহ্য, সরকার ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অধিকার ও সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ যা রাজনীতিকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে অবগত হতে পারে না।

গ) তথ্যের উৎস ও তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি: বর্তমান গবেষণায় পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উৎসই এই গবেষণার মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বিভিন্ন দেশি-বিদেশী গ্রন্থ, প্রবন্ধ, জার্নাল, দেশি-বিদেশী গবেষণা পত্রিকা, সংবাদ বিবৃতি, সংবাদপত্র পত্রিকা, ইন্টারনেট হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলসমূহের গণবিচ্ছিন্নতা: একটি বিশ্লেষণ:

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলসমূহের গণবিচ্ছিন্নতা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংবিধান অনুযায়ী জনগণই বাংলাদেশের মালিক। কিন্তু স্বাধীনতার ৪৭ বছর পরও এই মালিকানা তারা কতটা পেয়েছে, তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষিত হয়েছে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বর্তমান নির্বাচনগুলোতে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে এবং তারা রাজনৈতিক দলগুলো হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে ফলে ঘটছে গণবিচ্ছিন্নতা। [১]

রাজনৈতিক দলগুলো যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন এবং ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে পারি:

১৯৯৬ সালের নির্বাচন:

১৯৯৪ সালের ২৭ জুন আওয়ামী লীগ, জাতীয়পার্টি ও জামায়াত এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের রূপরেখা ঘোষণা করে। তারা বলে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোন দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দল অংশগ্রহণ করবে না। এবং তাদের রূপরেখা বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত গণ-আন্দোলন চলবে। বিরোধী দলগুলো তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংসদ বর্জন করে এবং ঘন ঘন হরতাল, ঘেরাও, বিক্ষোভ, রেলপথ-রাজপথ অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন এই নির্বাচনেও ব্যাপক অনিয়ম, কারচুপি ও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে। বিএনপি প্রার্থীগণ যেভাবেই হোক নির্বাচনে জয়লাভের চেষ্টা করেন। এই নির্বাচন সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিকদের কিছু মন্তব্য ছিল নিম্নরূপঃ

১) 'নির্বাচনটি ছিল নির্বাচনের নামে এক প্রহসন'।

২) 'আমি আমার সাংবাদিক জীবনে বিশ্বের কোথাও এমন নির্বাচন দেখিনি'।

৩) 'রাজনীতিকরা নির্বাচনের নামে এমনটা করতে পারেন কল্পনাও করা যায় না। বিবিসির সাংবাদিক আতাউস সামাদ ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রচারিত প্রতিবেদনে বলেন, "নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীদের পক্ষে যে বিপুল ভোট প্রাপ্তি দেখানো হয়েছে তাতে নিজের চোখ-কানের উপর বিশ্বাস নষ্ট করতে হয়'। গার্ডিয়ান পত্রিকার সুজন গোল্ডবার্গ বলেন, 'বিএনপি'র বিজয়কে আসলে বিজয় বলে গণ্য করা যায় না'। বর্তমান সরকার নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনায় ব্যর্থ। সত্যি সত্যি শতকরা কতজন ভোট দিয়েছেন তা বলার কোন উপায় নেই'।

১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে সংঘটিত ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির কারণে খালেদা জিয়ার সরকার বিশ্বাস যোগ্যতা হারায় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দলের আন্দোলন ব্যাপক গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে ঢাকাসহ বড় বড় শহরে "জনতার মঞ্চ" স্থাপন করা হয়, যেখানে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হন এবং সরকারি কর্মকর্তাসহ সকল পেশার নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়, সচিবালয় প্রায় অচল হয়ে যায় এবং জনজীবন দারুনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

১৯৯৬ সালের ১৯ থেকে ২৬ মার্চ বিতর্কিত ষষ্ঠ সংসদের একমাত্র অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫-২৬ তারিখের রাতে অনুষ্ঠিত শেষ বৈঠকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের বিধান সংবলিত ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল তাড়াহুড়া করে পাস করা হয়, যা ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে আইনে পরিণত হয়। প্রচন্ড গণ-আন্দোলনের মুখে ৩০ মার্চ বিএনপি সরকার পদত্যাগ করে এবং রাষ্ট্রপতি ষষ্ঠ সংসদ ভেঙ্গে দেন। [২]

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির দশম সংসদ নির্বাচন:

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালে প্রথমবারের মত দেশে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দল সমূহের প্রবল

আন্দোলনের মুখে ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করে এবং পরের (১৯৯৬ জুন, ২০০১ ও ২০০৮) তিনটি নির্বাচনও ওই ব্যবস্থার অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশে যত নির্বাচন হয়েছে তার কোনটিই সুখকর হয়নি। ক্ষমতাসীনরা নির্বাচনী ফলাফলকে বরাবরই নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করেছেন। ইতোপূর্বে দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পাঁচটি নির্বাচনে (১৯৭৩,১৯৭৯,১৯৮৬,১৯৮৮ এবং ১৯৯৬ ফেব্রুয়ারি) ব্যাপক জালিয়াতি এবং কারচুপির ঘটনা ঘটে। সেদিক থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনগুলো অবাধ ও বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে কার্যকর গণতন্ত্রের জন্য জনগণের প্রত্যাশা অপূরণীয়ই থেকে গেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনগুলো অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছিল বলে দেশে-বিদেশে বহু প্রশংসিত হলেও পরাজিত দল কারচুপির অভিযোগ উপস্থাপন করে। এও লক্ষ্যনীয় যে, সংসদীয় গণতন্ত্র পূনর্জীবনের পর এখন পর্যন্ত কোন দলই পূননির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। কারণ, প্রতিটি নির্বাচনেই ক্ষমতাসীন দলের কর্মকান্ড এমন ছিল যে ভোটাররা বিরোধী দলকে ক্ষমতায় গিয়ে ভাল কিছু করে দেখানোর একটি সুযোগ দিতে উন্মুখ হয়ে থাকেন। গণতান্ত্রিক যুগের চারটি সংসদ নির্বাচনেই (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ এর নির্বাচন ব্যতীত) বাংলাদেশের জনগণ ক্ষমতাসীন দল বা জোটকে প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে আওয়ামীলীগ ও বিএনপি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পালাক্রমে ক্ষমতায় আসলেও তাদের কোনো পক্ষই কাম্য ও বাঞ্ছিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এর বিপরীতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে চার রাজনৈতিক দল (আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী), তিন ব্যক্তিত্ব (শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, হু. মু. এরশাদ), দুই পরিবার (মুজিব ও জিয়া) এবং এক সমস্যা (রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ)।

চিত্র-১: গণতান্ত্রিক রাজনীতির মডেল

চিত্র-১: গণতান্ত্রিক রাজনীতির মডেল

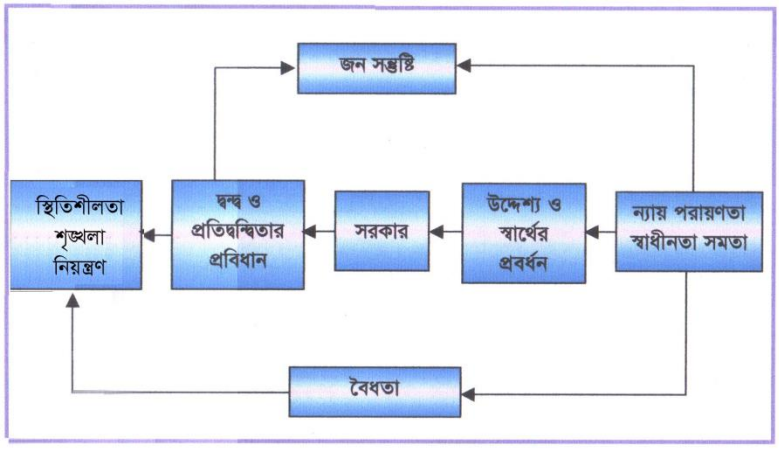

Source: D.E. Apter. Introduction to Political Analysis, India: Prentice Hall, 1981, p. 170.

মহাজোট সরকার ২০১১ সালের জুলাই মাসে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপ ঘটায়। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার

ক্ষেত্রে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আইনগত বিবেচনায় যথেষ্ট হলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় যথেষ্ট ছিল না। একাধিক জরিপে দেখা গেছে, দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন চায়। তত্ত্বাবধায়ক প্রশ্নে সব কয়টি জরিপেই জনগণের উচ্চ সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। প্রথম আলোর উদ্যোগে ওআরজি কোয়েস্ট রিসার্চ লিমিটেড পরিচালিত জনমত জরিপে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে মানুষের জোরালো মত ছিল যথাক্রমেঃ ২০১১ সালে ৭৩%, ২০১২ সালে ৭৬%, ২০১৩ সালের এপ্রিলে ৯০% এবং ২০১৩ সালের অক্টোবরে ৮২% ডেইলি স্টার এবং এশিয়া ফাউন্ডেশন এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত সর্বশেষ জনমত জরিপে (অক্টোবর, ২০১৩) ৭৭% মানুষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে মতামত প্রদান করে, যেখানে ২০১১ ও ২০১২ সালের জনমত জরিপে মানুষের এ আকাঙ্খা ছিল যথাক্রমে ৭৩.৯% ও ৬৭%।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের ফলে দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে সরকারের আশ্বাসে বিশ্বাস করলেও অভিজ্ঞতা ভিন্ন কথা বলে। অতীতে দলীয় সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনই নিরপেক্ষ হয়নি। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংকট সমাধানেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্ভব হয়েছিল এবং বর্তমানে পুনরায় এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি নিয়ে রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত। দুই জোটই গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতি বিসর্জন দিয়ে সংঘাত, সহিংসতা ও বল প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। অন্যদিকে পরিবর্তিত সংবিধানের দোহাই দিয়ে নির্বাচনকালীন সর্বদলীয় মন্ত্রিসভার নামে আজাওড়া সরকার গঠন করে মহাজোট। একটি কৌশলগত ক্ষমতা ভাগাভাগির মাধ্যমে আওয়ামীলীগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে সংখ্যালঘু এবং জাতীয় পার্টিকে সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যা গরিষ্ঠে পরিণত করা হয়। এর ব্যাখ্যায় বলা যায়, সংসদে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির (জাপা) আসন ২৩০ঃ২৭ । কিন্তু সর্বদলীয় মন্ত্রিসভার এ দু'টি দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল ২১ঃ৬। সে হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রতি ১১ জনে একজন মন্ত্রী, অন্যদিকে জাতীয় পার্টির প্রতি সাড়ে চারজনে একজন মন্ত্রী।

চিত্র-২: বাংলাদেশে নির্বাচনী বছরে প্রবৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র (১৯৯০-২০১৪)

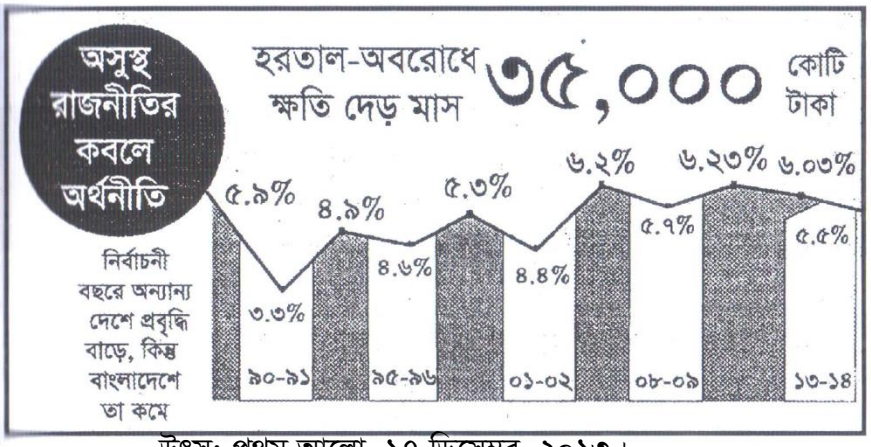

উৎস: প্রথম আলো, ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৩।

১৮ দলীয় জোট সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বহালের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ দাবির পক্ষে গণসমর্থন আদায়ে সমর্থন হলেও সরকারি দমন কৌশলের কারণে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি বিরোধী জোট। জাতিসংঘসহ দেশি-বিদেশি সমঝোতার উদ্যোগও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে দুই প্রধান জোটের মধ্যে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে গভীর সংকটে পড়ে দেশ। এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ে অর্থনীতিতে। পশ্চিমা দেশগুলোতে নির্বাচনী বছরে প্রবৃদ্ধি বাড়লেও বাংলাদেশে প্রতি নির্বাচনী বছরেই প্রবৃদ্ধি কমে যাচ্ছে (চিত্র-২)।

সরকার একতরফা নির্বাচনের পথ ধরলে বিরোধী জোটের দফায় দফায় টানা অবরোধ কর্মসূচি ও রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রাণ ও সম্পদহানি ঘটতে থাকে। নির্বাচনের আগে এত বিপুল সংখ্যক প্রাণহানির ঘটনা বাংলাদেশে ইতোপূর্বে কোনো নির্বাচনের আগে ঘটেনি। ২৫ নভেম্বর (২০১৩) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন থেকে ৪ জানুয়ারি (২০১৪) নির্বাচনের পূর্বদিন পর্যন্ত বিরোধী দলীয় জোট ছয় দফায় ২৬ দিন অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। এ সময়ের মধ্যে সারা দেশে প্রাণ হারান ১২৩ জন। অবশ্য বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই রাজনৈতিক সংঘাতে মৃত্যু অব্যাহত ছিল। এর কারণ মূলত দু'টি।

১) নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে দুই রাজনৈতিক জোটের মধ্যে অনৈক্য ;
২) একাত্তরের মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার।

উন্নয়নের জন্য একটা চলনসই গণতন্ত্র হলেই চলে। কিন্তু গণতন্ত্রের নির্বাচনগুলোতে প্রকৃত প্রতিযোগিতা না থাকলে একেবারেই চলে না। বিরোধী জোটের বর্জন আর সহিংস অবরোধের মধ্য দিয়েই সরকারি জোট ৫ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচনের শেষাঙ্ক মঞ্চস্থ করে। মোট ৪১টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে ১১টি দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় রাখতে সরকার প্রাণান্তকরন চেষ্টা করে। কিন্তু দলটির বারংবার সিদ্ধান্ত বদল আর বিভাজনের কারণে ক্ষমতাসীন মহলে বড় ধরনের ধাক্কা লাগে। উল্লেখ্য, প্রথমে নির্বাচনে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেও এরপর নির্বাচন বর্জনের আকস্মিক ঘোষণা দিয়ে দলের প্রার্থীদের মনোনয়ন প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন এরশাদ, একই সাথে তিনি দলের মন্ত্রী-উপদেষ্টাদের সর্বদলীয় সরকার থেকে পদত্যাগের নির্দেশ এবং দলীয় প্রতীক লাঙ্গল কাউকে বরাদ্দ না দিতে নির্বাচন কমিশনে চিঠি প্রদান করেন। এ নিয়ে সরকারের সঙ্গে এরশাদের টানাপোড়েন শুরু হলে এক পর্যায়ে তাঁকে অসুস্থ সাজিয়ে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) আটক রাখা হয়। তবে এরশাদ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিলেও রওশন এরশাদের নেতৃত্বে দলের একাংশ নির্বাচনে অংশ নেয়।
এরশাদের নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা ক্ষমতাসীন দলকে বড় ধরনের সংকটে ফেলে দেয়া উপরন্তু, ভোটের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ জন নির্বাচিত হওয়ায় এ নির্বাচনের বিশ্বাস যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ না হলেও প্রার্থীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বৈচিত্রে ভরপুর। প্রার্থীদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাঁদের অর্ধেকই ব্যবসায়ী। ৫৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে ব্যবসায়ী আছেন ২৮২ জন (৫২%)। প্রার্থীদের মধ্যে ৭১% স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের মধ্যে ৮২% স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। সহিংসা, প্রাণসংহার আর ভোটারদের বৃহৎ অংশের অনুপস্থিতির মধ্য দিয়ে নির্ধারিত তারিখেই অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। বিরোধী জোটের অনুপস্থিতিতে এটি মর্যাদা পায় একতরফা নির্বাচনের (জাতীয় পার্টিও সর্বতোভাবে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি)। নির্বাচনে মোট ৩০০টি আসনের

মধ্যে ১৪৭টি আসনের ভোট গ্রহণ করা হয়। ওই ১৪৭টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১০৮ টি, জাতীয়পার্টি ১৪টি, তরীকত ফেডারেশন ২টি, ওয়ার্কাস পার্টি ৪টি, জাসদ ২টি, বিএনএফ ১টি আসন লাভ করে। এছাড়া ১৫টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ১৫৩ আসনের মধ্যে আওয়ামীলীগ ১২৭টি, জাতীয়পার্টি (জাপা) ২০টি, জাসদ ৩টি, ওয়ার্কাস পার্টি ২টি ও জাতীয় পার্টি (জেপি) ১ টিতে বিজয়ী হয়। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও নির্বাচিত সব মিলিয়ে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের একক আসন সংখ্যা দাড়াঁয় ২৩৫টি, যা দলটিকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দেয়। জাতীয় পার্টি (জাপা) ৩৪টি আসন প্রাপ্ত হয়ে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করে। এছাড়া ওয়ার্কাস পার্টি ৬, জাসদ ৫ ও জাতীয়পার্টি (জেপি), তরীকত ফেডারেশন এবং বিএনএফ ১টি আসন প্রাপ্ত হয়।

সারণি-১ঃ বাংলাদেশে সহিংসতা ও নির্বাচন

নির্বাচন	প্রদত্ত ভোট (%)	নির্বাচন স্থগিত		সহিংসতার প্রকৃতি	
		সংসদীয় আসন	কেন্দ্র	সংঘর্ষের সংখ্যা (নির্বাচন পূর্ববর্তী)	নিহতের সংখ্যা (নির্বাচন দিন)
দশম*	৪০.৫	৮	৫৩৯	NA	২১
নবম*	৮৬.৩	১	NA	৪২	NA
অষ্টম	৭৪.৮	১৬	৯০	১৪৪	৩
সপ্তম	৭৪.৯	২৭	১২৩	NA	৪
পঞ্চম	৫৫.৪	১২	৩০	NA	১
চতুর্থ	৫২.৫	NA	২৩	১৯	৭
তৃতীয়	৬১.১	NA	২৮৪	২২১	৩২
দ্বিতীয়	৫১.৩	NA	৬৩	১২২	১৮
প্রথম	৫৪.৯	NA	৫৬	৮৫	১৩

Source: Kazi S.M Khasrul Alam Quddusi, 'Elections in Bangladesh: Who after Caretakers? Social Action, Vol. 63, (July-Sep, 2013), p. 275

*নবম ও দশম সংসদের তথ্য লেখকদ্বয় কর্তৃক বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত NA=Not Available.

নির্বাচনে ৫২% ভোটার নির্বাচনের দিনের আগেই তাঁদের ভোট প্রয়োগের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। যে কোনো সরকার যারা দুর্বল নির্বাচনী ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করে, অব্যাহত ভাবে তাদের কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় এবং ক্রমবর্ধমান হারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিপীড়নমূলক সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে। এর ফলে গণতান্ত্রিক চরিত্র খর্ব হয়।

সারণি-২: দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দলওয়ারী ফলাফল

দলের নাম	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় (প্রাপ্ত আসন)	ভোটে জয়ী (প্রাপ্ত আসন)	মোট প্রাপ্ত আসন
আওয়ামী লীগ	১২৭	১০৮	২৩৫
জাতীয় পার্টি (জাপা)	২০	১৪	৩৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	৩	২	৫
ওয়ার্কার্স পার্টি	২	৪	৬
জাতীয় পার্টি (জেপি)	১	০	১
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনএফ)	০	১	১
তরিকত ফেডারেশন	০	২	২
স্বতন্ত্র	০	১৫	১৫

উৎস: প্রথম আলো, ৭ জানুয়ারি ২০১৪ ও The Daily Star, 17 January 2014 থেকে সারণিকৃত।

*৫ জানুয়ারি ১৪৭টি আসনে ভোট গ্রহণ করে নির্বাচন কমিশন। ব্যাপক সহিংসতার কারণে ৮টি আসনে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়। পরে ১৬ জানুয়ারি স্থগিতকৃত আসনসমূহে পুণরায় ভোট গ্রহণ করা হয়। হাইকোর্টের নির্দেশে একটি আসনের (কুড়িগ্রাম-৪) ফলাফল পুণরায় স্থগিত করা হয়।

বিশ্লেষকদের মতে এ নির্বাচন শুধু প্রশ্নবিদ্ধ নয়। তিনটি কারণে বৈধতায় হারিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত কিছু কর্মকান্ড (বিএনএফকে নিবন্ধন প্রদান, আরপিও সংশোধনে বাঁধা না প্রদান, নিজের ক্ষমতা হ্রাসের চেষ্টা, বিতর্কিত ভাবে শিডিউল ঘোষণা) সরকারের প্রতি পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ দিয়েছে। উপরন্তু আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জোটের অনুকূলে নৌকা প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রেও কমিশন আইন মানেনি। এতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগেই তার বৈধতা ক্ষুন্ন হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ ও যুক্তরাষ্ট্রের মত আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রেরণ থেকে বিরত থাকে। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভোটার উপস্থিতির হার ৪০%; যদিও বিরোধী পক্ষ এই সংখ্যাকে তীব্রভাবে খন্ডন করে। তারা বড়জোর এর চারভাগের একভাগ ভোট পড়ে বলে দাবি করে। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, বিপুল পরিমাণ জাল ভোট পড়া সত্ত্বেও ২০% এর বেশি ভোট পড়েনি। তবে বিশেষজ্ঞ সূত্রে, নির্বাচনে ১২% এর কাছাকাছি ভোট পড়ে। অথচ ২০০৮ সালে ৮৬%, ২০০১ সালে ৭৪%, ১৯৯৬ সালে ৭৫% এবং ১৯৯১ সালে ৫৫% ভোট পড়েছিল। খালেদা জিয়া ভোটার বর্জিত একতরফা নির্বাচনকে কলঙ্কময় প্রহসন বলে আখ্যায়িত করে অবিলম্বে প্রহসনের নির্বাচন বাতিল, সরকারের

পদত্যাগ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে সবার অংশগ্রহণে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সমঝোতায় পৌছাঁর আহ্বান জানান। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর জাতিসংঘসহ গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলো আনুষ্ঠানিক ভাবে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর ব্যাপক উপস্থিতি সত্ত্বেও নির্বাচনের দিন ব্যাপক সহিংসতা হয়। এসব সহিংসতায় নির্বাচনের দিন ২১ জনের প্রাণহানি ঘটে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের গণবিচ্ছিন্নতা যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তা আমরা নিচের কয়েকটি শিরোনামের ভিত্তিতে আলোচনা করলেই বুঝতে পারবোঃ

(ক) মিছিল ও গণসমাবেশে দলীয় কর্মী ছাড়া সাধারণ জনগণের উপস্থিতি নগন্যঃ বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর মিছিল ও গণসমাবেশে দলীয় কর্মীর অংশগ্রহণই বেশি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ জনগণকে অংশগ্রহণ করতে তেমন দেখা যায় না। এখন রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ জনগণকে টাকা দিয়ে মিছিল মিটিং ও গণসমাবেশে অংশগ্রহণে উদ্ধুদ্ধ করে, অনেক সময় গরীব জনগণকে মিছিল ও গণসমাবেশে অংশ নিতে বাধ্য করে। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মিছিল-মিটিং ও গণসমাবেশে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছিল তুলনাহীন। বিভিন্ন মিছিল-মিটিং সমাবেশে ঐ সময় উপচেপড়া ভীড় লক্ষ্য করা যেত। যেমন-১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে সাধারণ জনগণ কি হারে উপস্থিত ছিল তা আমরা সবাই জানি। এছাড়া ১৯৯০ এর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনেও সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছিল তুলনাহীন।

(খ) **বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৯০ সালের পর থেকে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে জনসম্পৃক্ততা প্রায় অনুপস্থিতঃ** বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৯০ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক আন্দোলন হলে তাতে জনসম্পৃক্ততার হার থাকতো অনেক। কিন্তু বর্তমানে কোন আন্দোলন হলে তাতে জনসম্পৃক্ততা দেখা যায় না বললেই চলে। যেমন ১৯৯৬ সাল ও ২০১৪ সালের নির্বাচন তথা আন্দোলনে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছিলনা বললেই চলে। বর্তমান আন্দোলন গুলোতে পেশিশক্তির ব্যবহারই বেশি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া বিএনপির ২০১৪ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ২০১৩ সাল, ২০১৪ সাল এবং ২০১৫ সালে যেসব আন্দোলন হয় তাতে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল অনেক কম। দলীয় কর্মীরাই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এর কারণ যে কোন আন্দোলনে হয় সহিংসতা। এখনকার আন্দোলন শান্তিপূর্ণ হয় না। [৩]

সারণি-৩: ২০১৩ সালে রাজনৈতিক সহিংসতায় হতাহতের পরিসংখ্যান (জানুয়ারি-জুন)

মাস	আহত	নিহত	মোট
জানুয়ারি	১,৬৪৩	১৮	১,৬৬১
ফেব্রুয়ারি	২,৭৭২	৮৬	২,৮৫৮
মার্চ	৩,০৫৫	৭৬	৩,১৩১
এপ্রিল	১,৪৫০	২৬	১,৪৭৬
মে	৯৪৮	১০৭	১,০৫৫
জুন	৮৬২	৯	৮৭১
সর্বমোট	১০,৭৩০	৩২২	১১,০৫২

উৎস: অধিকার, ষান্মাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন (জানুয়ারি-জুন, ২০১৩), ১ জুলাই ২০১৩, পৃ. ২৩।

এছাড়া ২০১৪ সালেও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোতে অনেক সহিংসতা ঘটেছে। ২০১৫ সালে বিএনপি যে আন্দোলনের নামে হরতাল অবরোধ দেয় তাতে জনসম্পৃক্ততা ছিল না বললেই চলে। অনেক দিন হরতাল অবরোধ থাকায় সাধারণ জনগণ তা মানেওনি, ফলে সাধারণ জনগণ সহিংসতায় প্রাণ দিয়েছে অনেক, জেদাজেদির রাজনীতিতে রসাতলেও গিয়েছে দেশ। পেট্রোলবোমায় পুড়ে অঙ্গার হয়েছে শিশু, বৃদ্ধসহ অনেক মানুষ। [৪]

১৮ জানুয়ারী ২০১৫ এর প্রথম আলো পত্রিকায় অবরোধের ১৩তম দিনের একটি চিত্র এসেছে যেখানে দেখা যায় যে, সহিংসতার শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এখানে দেখানো হয়েছে যানবাহনে আগুন ও ভাংচুর ৫১৫, পেট্রোলবোমায় ও আগুনে ১১ জন, সংঘর্ষে ১০ জন এবং অন্যান্য ভাবে মোট ২৬ জন নিহত এবং অবরোধে নিহত ২৬ জনের ১৯ জনই রাজনীতির সাথে জড়িত নয়। ২০১৩ সালে সাধারণ মানুষ মারা যান ১৯৬ জন। এছাড়া ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সালের সহিংসতায় দুর্বৃত্তদের ছোড়া পেট্রোলবোমার আগুনে একসঙ্গে কেড়ে নিল নিরীহ সাধারণ সাতজন বাসযাত্রীর প্রাণ। বাসের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল অনেকেই, দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনে পুরে ঘটনাস্থলেই মারা যান বাবা মেয়ে, মা, ছেলেসহ ওই সাতজন। আহত হন আরও অন্তত ২৮ বাসযাত্রী। [৫]

এত সহিংসতা যদি কোন আন্দোলনে হয় তাহলে সাধারণ জনগণ অংশ নেয় কিভাবে ? ফলে ১৯৯০ এর পর পরবর্তী আন্দোলন গুলোতে জনসম্পৃক্ততা দিন দিন হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

(গ) **২০১৫ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে বিশেষ একটি দলের সমর্থক ছাড়া অন্যান্য দলের সমর্থকদের অনুপস্থিতি এবং নির্বাচনে কারচুপি:** ঢাকা উত্তর-দক্ষিন ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে যে অনিয়ম হয়েছে বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো পত্র-পত্রিকাতে তা উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের উল্লেখিত রিপোর্ট অনুযায়ী কিছু মন্তব্য তুলে ধরতে পারি:

তিন সিটি করপোরেশনে ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে যে নির্বাচন হলো আমাদের সে ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ হলো, নির্বাচনটি ভালো হয়নি। আশানুরূপ হয়নি। নির্বাচনে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ভোটারদের অংশগ্রহণ, পোলিং এজেন্ট, নির্বাচনী কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা। নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে হলে সবাইকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হয়। সিটি নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটছে বলা যাবে না। ব্রতীর পক্ষ থেকে আমরা ঢাকা উত্তর ও দক্ষিন সিটি করপোরেশনের ১৯১ টি ভোট কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করি। যার ভোটার সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার । এর প্রতিটি কেন্দ্রে আমাদের প্রতিনিধিরা কোনো না কোনো অনিয়ম প্রত্যক্ষ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ একটি কেন্দ্রের কথা বলতে পারি। পোলিং কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ব্যালট পেপার কখন নিয়েছেন, তিনি বললেন ১৫ মিনিট। এর মধ্যে ১০০ ভোট পড়েছে, যা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। অথচ বাইরে থেকে সেই ভোটকেন্দ্রের পরিবেশ ছিল শান্ত।

সকালে ভোটারদের ভিড় থাকলেও আমরা লক্ষ্য করি যে বেলা ১১টা থেকে তাদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। বেলা ২ টার পর গিয়ে দেখেছি, কেন্দ্র গুলোতে ভোটার নেই বললেই চলে। তবে গলায় ও বুকে সরকার সমর্থক প্রার্থীদের ছবি ঝোলানো বহু সংখ্যক তরুণকে মহড়া দিতে দেখেছি। অথচ আইন অনুযায়ী কেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে বাইরের কারও থাকার কথা নয়। সব মিলিয়ে বলবো, কেন্দ্রগুলোতে বেসামাল ও

বেহাল অবস্থা ছিল। আমরা বিভিন্ন বুথে গিয়ে দেখি ভোট দেওয়ার গোপন কক্ষে দু-তিনজন করে ঢুকেছেন, যদিও সেখানে একজনের বেশি যাওয়ার কথা নয়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বেশির ভাগ কেন্দ্রে আমরা বিরোধী দলের কোনো পোলিং এজেন্ট পাইনি। কোথাও তারা অস্বস্তিকর পরিবেশ দেখে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে গেছেন, কোথাও তাঁদের জোরপূর্বক বের করে দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় সেখানে দায়িত্বরত প্রিজাইডিং কর্মকর্তা ভয়ে কাপঁছেন। একদল যুবক ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। পরে পুলিশ তা উদ্ধার করে। এসব ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের যে ধরনের তদারকির প্রয়োজন ছিল তারা তা করেনি। কেন্দ্রের ভেতরে সহিংসতা ঘটেনি সত্য, অনিয়ম হয়েছে অহিংস কায়দায়। আর যেসব ভোটকেন্দ্রে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তাও হয়েছে আওয়ামী লীগের সমর্থক দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থীর মধ্যে নয়। [৬]

কেন্দ্র দখল আর নজিরবিহীন কারচুপির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো ঢাকা ও চট্টগ্রামের তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচন। নির্বাচনকে প্রহসন এবং তামাশা আখ্যায়িত করে দুপুর গড়ানোর আগেই একে বর্জনের ঘোষণা দেয় বিএনপি। রাজধানীতে সকাল ৮টা বাজার সাথে সাথেই প্রায় সব ভোটকেন্দ্রের দখল নেয় সরকারদলীয় লোকজন। বেশিরভাগ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি বিএনপি প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের। যেসব কেন্দ্রে তাদের পোলিং এজেন্ট প্রবেশের চেষ্টা করেছে তাদের বের করে দেয়া হয়েছে মারধর করে। কাউকে তুলে দেয়া হয় পুলিশের হাতে।

পোলিং এজেন্টদের বের করে দেয়ার পর সাধারণ ভোটাররাও যাতে ভোটকেন্দ্রে আসতে না পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভোট কেন্দ্রের আশেপাশের অলিগলি এবং কেন্দ্রের সামনে অবস্থান নেয় সরকারি দল ও তাদের অঙ্গসংগঠনের লোকজন।

ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে বাধাঁ দেয়া হয়েছে সাংবাদিক এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের। রাজধানীর বেশিরভাগ কেন্দ্রে সাংবাদিক বিশেষ করে টেলিভিশন সাংবাদিক প্রবেশ করতে চাইলে তারা পুলিশের বাধাঁর মুখোমুখি হন প্রথমে। তাদের জানানো হয় ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে কোনভাবেই প্রবেশ করা যাবে না। বিভিন্ন কেন্দ্রে সাংবাদিকদের মোবাইল, ক্যামেরা পরিচয় পত্র কেড়ে নেয়ার ঘটনা ঘটে। [৭]

মার্কিন দূতাবাস থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে ২৮ এপ্রিল ২০১৫ বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোট জালিয়াতি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতার যেসব ঘটনা ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষ দর্শীদের কাছ থেকে ব্যাপক ও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেদন পাওয়া গেছে এবং সিটি করপোরেশন নির্বাচন বয়কটের যে সিদ্ধান্ত বিএনপি নিয়েছে তাতে আমরা হতাশ। যেসব অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে তার স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া জরুরী। আইনের আওতায় থেকে কাজ করার জন্য এবং যেকোন সহিংসতা এড়ানোর জন্য আমরা সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই। রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোন ধরনের সহিংসতার আশ্রয় নেয়াকে আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। [৮]

ঢাকা ও চট্টগ্রামের তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা, বিপুল সংখ্যক ব্যালট ছিনতাই করে সিল মারা, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, ভোট কক্ষ দখল ও বিরোধী পক্ষের এজেন্টদের বের করে দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইলেকশন ওয়্যার্কিং গ্রুপ (ইউব্লিউজি) এতে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সার্বিক সততা ক্ষুন্ন

হয়েছে বলে মন্তব্য করে সংস্থাটি বলেছে, নির্বাচনের দিন সংগঠিত 'অপকর্ম' ও অনিয়মের কারণে তারা এ নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেনা। [৯]

সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের আশাবাদ প্রকাশের একদিন পরই ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। মার্শাস্টিফেনস ব্লুম বার্নিকাট ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে টুইটারে এক বার্তায় বলেন, "যেকোন ভাবে জেতা প্রকৃতপক্ষে কোনো জয় নয়।" খবর ইউএনবি ও বাসসের।

এদিকে মার্কিন দূতাবাসও এক বিবৃতিতে এই নির্বাচন নিয়ে হতাশার কথা জানিয়ে অনিয়মের ঘটনার স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত জরুরি বলে মন্তব্য করেছে। হতাশা জানিয়ে অনিয়মের তদন্ত দাবি করেছে যুক্তরাজ্যও।[১০]

এছাড়া "ক্ষমতাসীনদের ব্যাপক কারচুপি, জালিয়াতি ও কেন্দ্র দখল" দেখে নির্বাচনের দিন সকালেই ভোট বর্জনের ঘোষণা দিতে দলকে তাগাদা দিয়েছিলেন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে জাতীয় পার্টি সমর্থিত তিন মেয়র পদপ্রার্থী। কিন্তু দল তাঁদের পরামর্শ শোনেনি। [১১]

(ঘ) রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন ৩০ জুলাই ২০১৮ ছিল "অস্বাভাবিক ভোট" ও কারচুপির অভিযোগঃ

রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অনিয়ম, কেন্দ্র দখল ও কারচুপির অভিযোগের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে অস্বাভাবিক ভোট পড়ার হারও। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ১৩৮ টি কেন্দ্রের মধ্যে ১২ টিতে ৯০ শতাংশ বা এর বেশি এবং ৫৮টিতে ৮০ শতাংশ বা এর বেশি ভোট পড়েছে।
এছাড়া সিলেট সিটির কোথাও ১৯ শতাংশ আবার কোথাও ৯১ দশমিক ৭১ শতাংশ ভোট পড়েছে এ ভোট পড়ার হারকে অস্বাভাবিক মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা। শুধু তাই নয়, রাজশাহীতে একই ভোট কেন্দ্রে মেয়র, সাধারণ কাউন্সিলর ও নারী কাউন্সিলর পদেও ভোট পড়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা পাওয়া গেছে।

জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এম হাফিজ উদ্দিন খান যুগান্তরকে বলেন, তিন সিটিতেই অস্বাভাবিক হারে ভোট পড়েছে। এতে নির্বাচনে অনিয়ম, কারচুপি, কেন্দ্রদখল ও জাল ভোটের প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে। সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পড়বে, এটা কি সম্ভব?

রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনে এমন ভোট পড়ার হারকে অস্বাভাবিক উল্লেখ করে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার যুগান্তরকে বলেন, নির্বাচনে জালিয়াতি, কেন্দ্র দখল ও কারচুপি হয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে এ অস্বাভাবিক ভোট।

ভোটে অনিয়মের অভিযোগে বরিশাল সিটির ১২৩টি কেন্দ্রের মধ্যে একটিতে ভোট গ্রহণ বন্ধ এবং আরও ১৫টি কেন্দ্রের ফলাফল স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। সহিংসতা ও অনিয়মের ঘটনায় সিলেটের দুটি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে। তবে রাজশাহীতে কোন ভোট কেন্দ্র স্থগিত হয়নি। এ সিটিতে অনেক ভোটার তাদের ভোট দিতে পারেনি। ভোট দেয়ার দাবীতে রাস্তা অবরোধ করে কোন কোন কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ করেছেন ভোটাররা।

রাজশাহী সিটি করপোরেশনঃ ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ১৩৮টি ভোট কেন্দ্রের অর্ধেকের বেশি কেন্দ্রে ৮০ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পড়েছে। এর মধ্যে ১২টি ভোটকেন্দ্রে ৯০ শতাংশ বা তার বেশি ও ৫৮টিতে ৮০ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পড়েছে। বাকি কেন্দ্র গুলোতে ৭০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে ভোট পড়েছে। এছাড়া অনেক কেন্দ্রে মেয়র, সাধারণ কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে একেক ধরনের ভোট পড়ার তথ্য পাওয়া গেছে। ইসির একজন কর্মকর্তা নাম গোপন রাখার শর্তে জানান, একজন ভোটারকে মেয়র, সাধারণ কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদের পৃথক তিনটি ব্যালট পেপার ইস্যু করার নিয়ম রয়েছে। এ হিসাবে প্রত্যেকটি পদেই একই সংখ্যক ব্যালট ইস্যু হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু একই কেন্দ্রে একেক সংখ্যক ব্যালট ইস্যুর কারণ হচ্ছে হয় ভোটার তিন পদেই ব্যালট নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন অথবা ওই কেন্দ্রে কারচুপি হয়েছে।

সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোটের হারের অস্বাভাবিক তারতম্য দেখা গেছে। একটি কেন্দ্রে ৯১ দশমিক ৭১ শতাংশ ও আরেকটি কেন্দ্রে ১৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। নির্বাচন কর্মকর্তারা, এ দুইটিকেই অস্বাভাবিক ভোটের হার বলে মনে করছেন। এ সিটি নির্বাচনে আরও দুটি ভোটকেন্দ্রে প্রায় ৯০ শতাংশ ভোট পড়েছে।

৭টি কেন্দ্রে ৮০ শতাংশ বা তার বেশি ও ২৬ টি কেন্দ্রে ৭০ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পড়েছে। অপরদিকে অন্তত ৩টি ভোটকেন্দ্রে ৪০ শতাংশের কম ভোট পড়েছে। প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, এ সিটিতে সোনারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ৯১ দশমিক ৭১ শতাংশ ভোট পড়েছে।[১২]

বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অনিয়মের নানা অভিযোগ, ভোট বর্জন এবং বিক্ষিপ্ত গোলযোগের মধ্য দিয়ে বরিশাল, রাজশাহী এবং সিলেট এই তিনটি সিটি কর্পোরেশনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। [১৩]

(ঙ) অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক ভোটারদের উপস্থিতির যে হার দেখানো হয় তার বিশ্বাস যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকে যায়ঃ

বাংলাদেশে যে নির্বাচন সমূহ অনুষ্ঠিত হয় সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন ভোটারদের উপস্থিতির যে চিত্র তুলে ধরেন তা অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় না। সাধারণত বিশেষ কোন একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল বা সরকারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নির্বাচন কমিশন এই ধরনের কাজ করে থাকেন। এ ছাড়াও নির্বাচন কমিশন মনে করতে পারেন যে, নির্বাচনে গণ-অংশগ্রহণের হার যতই বেশি দেখানো যাবে ততই নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতাও সকলের নিকট বেড়ে যাবে। এই ব্যাপারটিকে তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশের কয়েকটি নির্বাচনে গণ-অংশগ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদন তুলে ধরা হলঃ

২০১৫ সালের ২৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত তিন সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি কম থাকলেও নির্বাচন কমিশনের (ইসি) হিসাবে ৪৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। নির্বাচন পর্যবেক্ষকসহ পরাজিত মেয়র প্রার্থীরা এত বেশি ভোট পড়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকি ভোট বর্জনের পরও বিএনপি সমর্থিত তিন মেয়র প্রার্থীর বিপুল সংখ্যক ভোট পাওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের অনেকেই বলেছেন, ক্ষমতাসীন দল সমর্থিত মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীর কর্মী সমর্থকেরা কেন্দ্র দখল করে দেদার সিল মারার কারণেই ভোটের পরিমাণ এত বেড়েছে। তাঁদের ধারণা,

প্রকৃতভাবে ১৫ থেকে ২০ শতাংশের বেশি ভোটার কেন্দ্রে আসেননি। কমিশন সচিবালয়ের হিসাব অনুযায়ী বাতিল ভোটের পরিমাণ ১ লাখ ২১ হাজার ৩। এর মধ্যে ঢাকা দক্ষিণে ৪০ হাজার ১৩০, উত্তরে ৩৩ হাজার ৫৮১ এবং চট্টগ্রামে ৪৭ হাজার ১৯২ ভোট ।

ইসি সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের কেউ কেউ মনে করেন, কেন্দ্র দখল করে ব্যালটে সিল মারার কারণে এবার তিন সিটিতে বাতিল ভোটের পরিমাণ অস্বাভাবিক বেশি।

২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে ভোটের দিন প্রথম আলোর ১৩ জন প্রতিবেদক সারাদিন দক্ষিণে এবং ১৪ জন প্রতিবেদক উত্তরে ঘুরেছেন। মোট ২৭৯টি কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে, সকালের দিকে কোথাও কোথাও ভোটার থাকলেও দুপুরের পর ভোটার শূন্য হয়ে পড়ে বেশির ভাগ কেন্দ্র। একই অবস্থা ছিল চট্টগ্রামেও।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের আইডিয়াল কলেজের একটি কেন্দ্রে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোটারদের উপস্থিতি ছিল একেবারেই কম। কিন্তু ইসির তথ্য অনুযায়ী, এই কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৬৮ শতাংশ। ওই কেন্দ্রের একজন ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেছেন, এই কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ভোটার এসেছিলেন বাকিটা ক্ষমতাসীন দলের লোকজন সিল মেরে নিয়েছে।

ঢাকা দক্ষিণের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের একজন ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর কেন্দ্রে স্বাভাবিক ভাবে ভোট পড়েছে ২০ শতাংশ। কিন্তু জোর করে সিল মারায় এটি প্রায় ৭০ শতাংশ হয়ে যায়। উত্তরের একটি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং কর্মকর্তা বলেন, বাইরের লোকজন যখন জোর করে ব্যালট নিয়ে গেল, তখন পুলিশকে বাঁধা দিতে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু পুলিশ কিছুই করেনি। ওই ঘটনার পর থেকে এখনো তিনি স্বাভাবিক হতে পারছেন না। ঢাকা দক্ষিণের মোট ভোটার ১৮ লাখ ৭০ হাজার ৭৭৮ জন। ভোট পড়েছে ৮ লাখ ৬৫ হাজার ৩৫৪ । এর মধ্যে সাঈদ খোকন ৫ লাখ ৩৫ হাজার ২৯৬ পেয়ে বিজয়ী হন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মির্জা আব্বাস পান ২ লাখ ৯৪ হাজার ২৯১ ভোট।
মির্জা আব্বাসের স্ত্রী আফরোজা আব্বাস প্রথম আলোকে বলেন, 'ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে প্রায় ৪৯ শতাংশ ভোট গ্রহণ দেখানো হয়েছে। এটা অবিশ্বাস্য। আমি যেসব কেন্দ্রে গিয়েছি, সেখানে ১১টা পর্যন্ত ১৫ শতাংশের বেশি ভোট পড়েনি। আর বিএনপি ভোট বর্জনের পর তো ভোটাররা কেন্দ্রেই যাননি। তাহলে ৪৯ শতাংশ ভোট কোন্থেকে আসে ?

ঢাকা উত্তরে মোট ভোটার ২৩ লাখ ৪৪ হাজার ৯০০ জন। ভোট পড়েছে ৮ লাখ ৪১ হাজার। আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিজয়ী মেয়র প্রার্থী আনিসুল হক ৪ লাখ ৬০ হাজার ১১৭ ভোট এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি সমর্থিত তাবিথ আউয়াল ৩ লাখ ২৫ হাজার ৮০ ভোট পেয়েছেন।[১৪]

বিভিন্ন বিতর্কের মধ্যে শেষ হওয়া ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ৫৬.০৭ শতাংশ ভোটার ভোট কেন্দ্রে যাননি। ভোট পড়েছে ৪৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ। এর মধ্যে রয়েছে জাল ভোট। কেন্দ্র গুলোতে সকালের দিকে ভোটার উপস্থিত থাকলেও বেলা সাড়ে ১১ টায় বিএনপি সহ ২০ দলীয় জোটের নির্বাচন থেকে সরে দাড়াঁনোর ঘোষণায় ভোটাররা কেন্দ্র থেকে চলে আসেন। এত ঢাকঢোল পিটিয়েও নির্বাচন কমিশন শতভাগ ভোটারকে উপস্থিত করাতে পারেননি। ভোটার উপস্থিতির এ তথ্য দিয়েছে নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ বিভাগ।

অথচ সিইসি গতকাল সাংবাদিকদের জানান সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। উৎসাহ নিয়ে ভোট দিয়েছেন ভোটাররা। ভোটারদের উপস্থিতিও ব্যাপক ছিল। [১৫]

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ৭৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। অর্থাৎ ৩ লাখ ১৮ হাজার ১৩৮ ভোটের মধ্যে ২ লাখ ৫০ হাজার ৮৮১ ভোট পড়েছে। বৈধ ২ লাখ ৪৭ হাজার ১৯০ ভোটের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন ১ লাখ ৬৫ হাজার ৯৬ ভোট পেয়ে বেসরকারি ভাবে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

অপরদিকে বিএনপির মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল পেয়েছেন ৭৭ হাজার ৭০০ ভোট। বাতিল ভোটের সংখ্যা ৩ হাজার ৬৯১ টি। অপরদিকে সিলেট সিটিতে ভোট পড়েছে ৬১ দশমিক ৭৫ শতাংশ। এ সিটিতে ৩ লাখ ২১ হাজার ৭৩২ টি ভোটের মধ্যে বৈধ ভোট ১ লাখ ৯১ হাজার ২৮৯টি ও বাতিল ৭ হাজার ৩৬৭ টি ভোট। এ সিটিতে প্রায় ৪ শতাংশ ভোট নষ্ট হয়েছে।

সোমবার তিন সিটি কর্পোরেশনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তিনটিতেই কমবেশি কারচুপি কেন্দ্র দখল করে জালভোট, ধানের শীষের এজেন্টদের বের করে দেয়া প্রার্থীকে মারধর, সহিংসতাসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ করেছে বিএনপিসহ অন্যদলের প্রার্থী ও সংশ্লিষ্টরা । তারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধেও পক্ষপাতের অভিযোগ আনেন। [১৬]

তাছাড়া ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল কারচুপির পরও ২৬.৫৪%। কিন্তু নির্বাচন কমিশন বলে এই হার ছিল অনেক বেশি।[১৭]

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভোটার উপস্থিতির হার ৪০% যদিও বিরোধী পক্ষ এই সংখ্যাকে তীব্রভাবে খন্ডন করে। তারা বড়জোর এর চারভাগের একভাগ ভোট পড়ে বলে দাবি করে। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকরা বলেছেন, বিপুল পরিমাণ জাল ভোট পড়া সত্ত্বেও ২০% এর বেশি ভোট পড়েনি। তবে বিশেষজ্ঞ সূত্রে, নির্বাচনে ১২% এর কাছাকাছি ভোট পড়ে। [১৮]

(চ) রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার অভাব পরিলক্ষিত হয়:

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র চর্চা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তাই দলগুলোর গঠনতন্ত্রে যা থাকুক না কেন, বাস্তবে দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক নিয়ম-নীতি বা বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায় না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় স্বাধীনতার সুদীর্ঘ ৩০ বছরেও দেশটির রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় গণতন্ত্রের চর্চা খুব সামান্যই পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এই প্রবণতার কারণসমূহ আলোচনা করা হলো-

১) **সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব:** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব অত্যন্ত প্রকট। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রাণ দিতে হয়েছে। জেনারেল জিয়ার সম্ভাবনাময় নেতৃত্বকেও বিকশিত হতে দেয়া হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরাধিকার ও অর্থবিত্তের বদৌলতে অযোগ্য ব্যক্তিবৃন্দ রাজনৈতিক দলের কর্ণধারে দলগুলোকে অগণতান্ত্রিক রূপদান বহুলাংশে ভূমিকা পালন করেছে।

২) **দল ছুট প্রবণতা:** বাংলাদেশে দল ব্যবস্থার অভ্যন্তরে তুখোড় লবিং গ্রুপিং এর মাধ্যমেও যদি কোন নেতা তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হতে না পারে তাহলে সে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে তোয়াক্কা না

করে দল ভেঙ্গে চলে যায় কিংবা অন্যদলের টানে গিয়ে ভীরে। এর অবশ্য একটি বড় কারণ হল তার নিজ দলের ভিতরে গণতান্ত্রিক চর্চা না থাকা।

৩) **নেতা সৃষ্টির সংকট:** বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি দলের মধ্যেই সন্ত্রাসী পোষণ, দুষ্টের লালনের সংস্কৃতি রয়েছে। এখানে কোন মেধাবীদের মূল্যায়ন তেমন হয় না। নেতৃত্বের যোগ্যতা যাচাই হয় সন্ত্রাসী, হাক্‌ডাক্‌, পিকেটিং ইত্যাদির মাপকাঠিতে। ফলে দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ উপেক্ষিত হয় এবং এর চর্চা হয়ে পড়ে নগন্য।

৪) **জবাবদিহিতার অভাব:** যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নেতৃবৃন্দের জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বচ্ছতাদানের মাধ্যম বিশেষ। কিন্তু বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে এ ধরণের মানসিকতা প্রায় অনুপস্থিত। নেতৃবৃন্দের একগুয়েমি এবং অগণতান্ত্রিক মানসিকতা রাজনৈতিক স্বৈরাচারী রূপ দান করেছে।

৫) **স্বজনপ্রীতি:** বাংলাদেশের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ব্যক্তিদেরকে নিজ দলে আনার জন্য অন্যায়ভাবে অনেক প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। সরকারের ধামাধরা ও আজ্ঞাবাহীদের অধিক সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

৬। **ধর্মীয় প্রভাব:** বাংলাদেশ গোঁড়া মৌলবাদী রাষ্ট্র না হলেও দেশটির রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মীয় বিভাজন অতি স্পষ্ট। শতকরা ৯০ জন মুসলমান অধ্যুষিত এই দেশের কোন দলের পক্ষেই সম্ভব হয় না এ ধর্ম বিশ্বাসকে খাটো করে দেখা। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোটের ন্যায় ধর্মভিত্তিক দলগুলো তাদের দলীয় কর্মসূচিতে ধর্মীয় নীতিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়।

৭) **গঠনতন্ত্রের অকার্যকারিতা:** বাংলাদেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র রয়েছে। কিন্তু দলগুলো তাদের গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত বিধানাবলি খুব কমই অনুসরণ করে। এমতাবস্তায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা একেবারেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

৮) **রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ:** বেসামরিক রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের এক অমোঘ দুষ্টক্ষত। স্বাধীনতা অর্জনের অল্প কিছু দিন পরেই দেশে সংঘটিত হয় সশস্ত্র সামরিক অভ্যুত্থান। তারপর একের পর এক সামরিক নেতৃত্ব দ্বারা এদেশ হয়েছে শাসিত। সামরিক শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতা লিপ্সাকে স্থায়িত্বদানের জন্য একাধিক রাজনৈতিক দল গঠন করে। স্বভাবতই এই সমস্ত দলে গণতন্ত্র চর্চা আশা করা যায় না।

৯) **সামরিক-বেসামরিক আমলার নির্ভরশীলতা:** বাংলাদেশের দল ব্যবস্থায় দলগুলোর মধ্যে সামরিক, বেসামরিক আমলাদেরকে জড়ানোর বা আকর্ষণ করার প্রবণতা গণতান্ত্রিক চর্চাকে ব্যাহত করেছে। এক্ষেত্রে বি.এন.পি. সবচেয়ে এগিয়ে। সামরিক বেসামরিক আমলাবর্গ অবসর গ্রহণের পর দলের অন্যান্য নেতা-নেত্রীদের ডিঙ্গিয়ে দলে একটি বড় অবস্থান নিয়ে ঢুকে পড়ার সুযোগ পায়। ফলে দলের মধ্যে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক বিকাশ সম্ভবপর হয় না।

১০) **অভ্যন্তরীণ কোন্দলঃ** রাজনৈতিক দল ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দলাদলি খুবই স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোয় এই কোন্দল অপেক্ষাকৃত অধিক এবং প্রায়ই তা ধ্বংসাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলো ভাঙ্গনে সম্মুখীন হয়। দলে সাংগঠনিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় কোন দলের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় না।

১১) **দলের মধ্যে উত্তরাধিকার সম্পর্কঃ** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থায় বড় দু'টি দলের (যেমন- আওয়ামী লীগ ও বি.এন.পি) মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ও সিনিয়রিটি পদ্ধতি মানা হচ্ছে না। এখানে দলের সভাপতির বা কর্ণধারের উত্তরাধিকার ভিত্তিতে পরবর্তী নেতৃত্ব আসছে। অন্যান্য দলের মধ্যেও কমবেশি এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় দলগুলোর মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ সাধিত হয় নি। [১৯]

ছ) **ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার দলীয় কর্মীদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সুষ্ঠু বিচার হয় নাঃ**

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার দলীয় কর্মীরা সন্ত্রাসী, দুর্নীতি, গুরুতর অন্যায় করলেও তাদের এসব কার্যকলাপের সুষ্ঠু বিচার হয় না। ফলে সরকার দলীয় কর্মীরা আরও বেশি সন্ত্রাসের সাথে লিপ্ত হতে থাকে। কিন্তু বিরোধী দল বা অন্যান্য রাজনৈতিক দল বা সাধারণ জনগণ কোন অন্যায়, সন্ত্রাস করলে তাদের বিচার দ্রুতই হতে দেখা যায়। ফলে যা দেখে সাধারণ জনগণ রাজনৈতিক দলগুলো হতে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। যার ফলে ঘটে গণবিচ্ছিন্নতা।

জ) রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির সাথে লিপ্ত হওয়াঃ

দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। উন্নত-অনুন্নত সব দেশেই এই ব্যাধির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। দুর্নীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক গভীর । রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন দুর্নীতির জন্ম দেয়। আমাদের দেশে নির্বাচনের সময় প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। যিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে নির্বাচিত হন তিনি পরবর্তী সময় ওই টাকা ওঠানোর চেষ্টা করেন। ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতা ধরে রাখতে সন্ত্রাসীদের লালন পালন করেন। আর যারা ক্ষমতায় যেতে চান তারা একই পথ অনুসরণ করেন। ফলে দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ব্যাপক দুর্নীতির কথা অকপটে স্বীকার করে বলেন, জনগণের দুঃখ-দুর্দশার ৩০% দূর হতে পারে যদি দুর্নীতি বন্ধ করা যায়। কিন্তু দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। দুর্নীতির দায়ে কিছু সংখ্যক আমলাকে বরখাস্ত বা আটক করা হলেও সন্দেহভাজন রাজনীতিকরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যান। জেনারেল জিয়াউর রহমান ব্যক্তিগত জীবনে সৎ বলে পরিচিত হলেও নিজস্ব দল ও প্রশাসন গড়ে তুলতে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। কিন্তু নিজেই আষ্টে পৃষ্ঠে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। এবং দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ শাসক হিসেবে পরিচিতি পান। এরশাদের পতন হলেও দুর্নীতির উত্থান রোধ করা যায়নি। বেগম জিয়ার প্রথম সরকারের আমলে (১৯৯১-১৯৯৬) তৎকালীন কৃষি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সংসদীয় তদন্ত কমিটিতে বিষয়টি প্রেরিত হয়, কিন্তু কমিটি কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পারেনি। শেখ হাসিনার প্রথম শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) উচ্চ পর্যায়ের কোন রাজনীতিকের বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। তবে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতির প্রসার ঘটে। জার্মানী ভিত্তিক আন্তর্জাতিক

বেসরকারি সংস্থা ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি) তার ২০০১ সালের রিপোর্টে বাংলাদেশকে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে চিহ্নিত করে।

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে তোড়জোড় করে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান শুরু করে। দুর্নীতি দমন কমিশন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী-সাংসদ এবং কয়েকজন বড় ব্যবসায়ী ও আমলাসহ ২২২ জন সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজের তালিকা প্রকাশ করে। এদের অনেককেই জরুরি আইনের অধীনে বিশেষ আদালতে তড়িঘড়ি করে বিচার করে দীর্ঘ কারাদন্ড প্রদান ও জরিমানা করা হয়। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অনেক সামরিক কর্মকর্তা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে বলে ধারণা করা হয়। তবে ওই সরকারের আমলে সাধারণ দুর্নীতির মাত্রা সামান্য হ্রাস পায়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেখ হাসিনা এবং দুইপুত্রসহ বেগম খালেদা জিয়াকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করে। বর্তমানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী, এমপি ও সরকার দলীয় সদস্যদের বিরুদ্ধে ও সংবাদ মাধ্যম সমূহে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। এ সকল অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে সরকার কি ভূমিকা পালন করছেন তা লক্ষ্য করার বিষয় । সরকার এ বিষয়গুলি নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ তদন্ত করলে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সরকারের প্রতি তথা সরকারি দলের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এমনটি না হলে সরকার ও সরকারি দল গণআস্থা হারাবে এবং ক্রমান্বয়ে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। [২০]

ঝ) হরতাল-অবরোধের রাজনীতি:

আমাদের দেশে এ যাবৎ অনুষ্ঠিত প্রায় সব নির্বাচনই বিভিন্ন দোষে দুষ্ট। অপপ্রচার, কালো টাকা ও পেশিশক্তির ব্যবহার নির্বাচনগুলোকে এতটাই কলুষিত করে যে, তাতে জনমতের প্রতিফলন কতটুকু ঘটে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। পাঁচ বছর পর পর অনুষ্ঠেয় নির্বাচন ভোটারদের নিকট শাষকদের জবাবদিহিতার কার্যকর প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে উঠতে পারেনি। সংবিধানের বিধান মতে নির্বাহী বিভাগ সংসদের নিকট দায়বদ্ধ। কিন্তু এই দায়বদ্ধতা প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

সংসদের বাইরে বিভিন্ন সংগঠন সাধারণত হরতাল, সভাসমাবেশ, মিছিল, বিক্ষোভ, ঘেরাও, অবরোধ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের দাবি-দাওয়া, ও অভিযোগ তুলে ধরে। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা এ ধরণের শান্তিপূর্ণ কার্যকলাপও বরদাস্ত করতে চায় না।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলো সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে হরতালকে বেছে নেয় এবং এর ব্যবহার ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ সালে গড়ে প্রতি বছর ১২ দিন হরতাল হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৬ সালে এ সংখ্যা গড়ে ১৪ দিন, ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সালে গড়ে ৮২ দিন, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সালে গড়ে ৭২ দিন। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সালে গড়ে ৯৩ দিন, ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রতিবছর গড়ে ১১১ দিন হরতাল হয়। যতদিন যাচ্ছে বিরোধী দল আন্দোলনের কলাকৌশল বদলাচ্ছে। তেমনি সরকার কঠোর হচ্ছে, দমন-পীড়নের মাত্রা বাড়ছে।

শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামল তুলনা করলে প্রায় একই রূপ চিত্র দেখা যায়। হরতালের সময় রাস্তায় খুনোখুনি হয়। পিকেটিং এর বদলে বোমাবাজি হয় হরতালের নায়ক। বিরোধী দলকে রাস্তায় নামতে দেয়া হয় না। পুলিশ দিয়ে তাদেরকে দলীয় কার্যালয়ে আবদ্ধ রাখা হয়। এমনকি মহিলা নেতা-কর্মীরাও পুলিশের লাঠিপেটা ও টানা-হেঁচড়ার শিকার হন। সভা সমাবেশ বানচাল করতে

হাজার হাজার নেতাকর্মী ও নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার করা হয়; কখনো বা পরিবহন সংকট সৃষ্টি করে বিরোধী পক্ষের সমাবেশে যোগদান বাঁধাগ্রস্ত করা হয়। অনেক সময় হরতাল অবরোধ চলাকালে রাজনৈতিক দলের কর্মী ছাড়াও সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি অনেক সময় নিরীহ মহিলা ও শিশুরাও বিভিন্ন দূর্ঘটনার শিকার হন। এমন অবস্থায় সাধারণ জনগণ হরতাল অবরোধকে সমর্থন করতে চান না, ব্যাপারটি রাজনৈতিক দল ও জনগণের মধ্যে এক বিশাল দূরত্ব তৈরি করে। [২১]

হরতাল-অবরোধে জানমালের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার কিছু চিত্র আমরা নমুনা হিসাবে তুলে ধরতে পারিঃ

১৭ এপ্রিল, ২০১২ সিলেটের বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী নিখোঁজ হন । এর আগে সিলেটে কয়েকজন স্থানীয় বিএনপি নেতা দলীয় কোন্দলে গুম বা খুন হন বলে খবর প্রকাশিত হয়। ইলিয়াস আলীর অপহরণের কয়েক ঘন্টার মধ্যে বেগম খালেদা জিয়া অভিযোগ করে, সরকারের এজেন্সি, ও র‍্যাবের লোকজন ইলিয়াসকে অপহরণ করে। বিএনপি তাঁকে উদ্ধারের দাবিতে সিলেটে স্থানীয়ভাবে ৩ দিন এবং সারাদেশ ব্যাপী ৬ দিন সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করে। প্রতিদিন হরতালের সময় ও পূর্ব রাতে ককটেল নিক্ষেপ, যানবাহন ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ঢাকায় ২ জন গাড়িচালক নিহত হন, একজন ঘুমন্ত অবস্থায় বাসের ভেতরে আগুনে পুড়ে মরেন, অন্যজন হরতাল কারীদের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে দূর্ঘটনায় প্রাণ হারান। এমনকি, সচিবালয়ের গেটে ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের সামনে বোমা নিক্ষেপ হয়। সিলেটের বিশ্বনাথ ও ইলিয়াস সমর্থকেরা বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে। সেখানে মৃত্যু হয় ২ জনের, আহত হয় পুলিশ সহ অসংখ্য মানুষ।[২২]

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহালের দাবিতে বিএনপি জামায়াত ২০১৫ সালের ৬ জানুয়ারি থেকেই টানা ৮৭ দিনের অবরোধ কর্মসূচি দেয় এবং সাথে কিছুদিন হরতালও থাকে। যার ফলে অসংখ্য মানুষ পেট্রোলবোমায় মারা যান এবং আহত হন। গাড়িতে আগুন দেয়া হয়, অনেক যানবাহন ভাংচুর করা হয়। পেট্রোলবোমার হাত থেকে শিশু এমনকি বৃদ্ধরা পর্যন্ত রেহাই পাননি। দেশ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এবার দুর্বৃত্তদের ছোড়া পেট্রোলবোমার আগুন কেড়ে নিল নিরীহ সাধারণ সাতজন বাসযাত্রীর প্রাণ। বাসের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন অনেকেই। এর মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনে পুড়ে ঘটনাস্থলেই মারাযান বাবা-মেয়ে, মা-ছেলেসহ ওই সাতজন। আহত হন আরও অন্তত ২৮ জন বাসযাত্রী। [২৩]

৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে বিএনপির হরতাল অবরোধে রাতে গাজীপুরে যাত্রীবাহী বাসে পেট্রোলবোমা হামলায় মরিয়মের ছোট্র শরীরের বুক থেকে পা পর্যন্ত পুড়ে গেছে। শুরুতে ওয়ার্ডে রাখা হলেও ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বেলা তিনটার দিকে তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। একই ঘটনায় দগ্ধ ১২ বছরের শিশু রাকিব মিয়াও নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকেরা বলেছেন, মরিয়ম ও রাকিব দু'জনের অবস্থাই খুবই আশঙ্কাজনক।[২৪]

এসব হরতাল-অবরোধে মানুষের জান-মালের অনেক ক্ষতি হওয়ার ফলে সাধারণ জনগণ রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে আর এর ফলে দিন দিন বাড়ছে গণবিচ্ছিন্নতা।

সমস্যা সমাধানের উপায় ও সুপারিশমালাঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা শেষে বলা যায় যে, এদেশে গণতন্ত্র কেবলমাত্র তখনই সফল হবে যখন রাজনৈতিক দলগুলো বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি নিয়ে

দেশ পরিচালনা করবে এবং নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা করবে। এই লক্ষ্য দুটো অর্জনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে কতগুলো পদক্ষেপ নিতে হবে। যা নিলে রাজনৈতিক দলগুলো হতে সাধারণ জনগণও বিচ্ছিন্ন হবে না। এগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

(ক) গণতন্ত্রের উন্নয়নের স্বার্থে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থাৎ সরকারি ও বিরোধী দল উভয়কেই তাদের অগণতান্ত্রিক চর্চা পরিত্যাগ করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সরকারি দলকে সর্বপ্রথম এবং সর্বাগ্নে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে দলীয় কর্মীদের স্বার্থে ব্যবহার করা বর্জন করতে হবে এবং বিরোধী দলকে অহেতুক অত্যাচার-নির্যাতন করা থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।[২৫]

(খ) সত্যিকারের পৃথককরণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত এবং আইনের শাসন কায়েম করা। উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ ও অপসারণের জন্য একটি আইন প্রনয়ণ করা। আদালতকে বিশেষ করে নিম্ন আদালতকে প্রভাবিত করার, রাজনৈতিক হয়রানি মূলক মামলা রুজু ও রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহারের সংস্কৃতি অবসান করা।

(গ) সঠিক ব্যক্তিদের স্বচ্ছতার সঙ্গে নির্বাচন কমিশন পুর্নগঠনের লক্ষ্যে সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী একটি আইন প্রনয়ণ এবং তা অনুসরণে কমিশনে নিয়োগ প্রদান করা । গ্রহনযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান ও আইনি কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা। এর দ্বারা জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

(ঘ) দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে এবং প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করতে হবে। সেই সাথে বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ন্যায়পাল পদ থাকলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি তার বাস্তবায়ন তথা ন্যায়পাল পদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। বিদেশে অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা এবং বিদেশে পাচার করা অর্থ ফেরত আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল গঠনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন, দলের মনোনয়ন ও অর্থায়নে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং দলীয়করনের সংস্কৃতির অবসান করা। রাজনৈতিক দলের পক্ষথেকে উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, পরিচয়ভিত্তিক বিদ্বেষ ও সহিংসতা পরিহার করার অঙ্গীকার নিশ্চিত করা। দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন বিলুপ্ত করা।

(চ) আর্থিক খাতে লুটপাট প্রতিরোধে ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার এবং লুটপাটকারীদের বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা। ব্যাংকিং খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা ও নিবিড় তদারকি নিশ্চিত করা।[২৬]

(ছ) রাজনৈতিক দলগুলোকে সংসদ বর্জন বন্ধ করতে হবে যখন তারা বিরোধী দলে থাকে। বিরোধী দলকে সংসদে উপস্থিত থেকে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে তাদের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাহলে সংসদ সরকারের জবাবদিহিতার কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হবে।

(জ) নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা পালন করা অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা চিরস্থায়ী নয়। তাদের টেনে ধরার রশি জনগণের হাতে। রাজনৈতিক দলগুলো যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসেন তা পূরণ করে না বা করতে পারে না বিধায় জনগণ তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ফলে গণবিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। তাই তা দূর করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই জনগণকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণ করতে হবে।

(ঝ) বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের গণবিচ্ছিন্নতা হ্রাস করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করা। সরকারের সাথে জনগণের যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে আর তা করতে পারলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও তার প্রাণ ফিরে পাবে। কারণ গণতন্ত্র না থাকলে দেশে বিশৃঙ্খল পরিবেশ দেখা দেবে যা গণবিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি করবে। আর এর জন্যই সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করতে হবে।

(ঞ) বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর যে মূলনীতি রয়েছে তা পালন করতে হবে। এবং তারা নির্বাচনের পূর্বে যে ইশতেহার দেয় তা ক্ষমতায় গিয়ে অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলে জনগণের ধারণা রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি নেতিবাচক না হয়ে ইতিবাচক হবে এবং জনগণ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের গণবিচ্ছিন্নতা অনেকটা হ্রাস পাবে। [২৭]

উপসংহার: উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি যে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের গণবিচ্ছিন্নতা ১৯৯০ এর পূর্বে তেমন ছিলনা, কিন্তু ৯০ এর পরবর্তী পর্যায়ে তা অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালির ভাগ্য নির্ধারণ করল। পূর্ব বাংলার পূর্ণস্বায়ত্তশাসন ও শেখ মুজিবের ছয় দফার জন্য ম্যান্ডেট। নতুন স্লোগান, 'তোমার আমার ঠিকানা/পদ্মা মেঘনা যমুনা পাকিস্তানের কওমি সংগীতে যে বলা হয়েছিল 'ধূসর সিন্ধু মরু সাহারা' বাঙ্গালির কাছে ওসব অর্থহীন ও অবাস্তব মনে হলো। পাকিস্তানি শাসকদের বাঙ্গালি তার ইচ্ছার কথা জানিয়ে দিল ভোটের মাধ্যমে । বাংলার মানুষ যে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ চেয়েছিল, সে স্বপ্নটি অপূর্ণ থাকলো, স্বাধীনতা এল কিন্তু শোষণ-বঞ্চনার অবসান হলো না। সত্তরে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন'? বাস্তবে দেশটা কখনোই শ্মশান বা গোরস্থান ছিলনা, সোনার বাংলাও ছিল না। ছিল সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, নদ-নদী বিধৌত বাংলা। মানুষ খেয়ে-পরে বেঁচে রইল বটে, কিন্তু যে গণতন্ত্র চেয়েছিল, তা পেল না।

রাজনীতিকেরা ব্যক্তির চেয়ে দল, দলের চেয়ে দেশ বড় স্লোগান দেন, কিন্তু কাজ করেন ঠিক তার বিপরীত। রাজনীতিতে ভারসাম্য আনতে হলে রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সব ক্ষেত্রেই ভারসাম্য আনা জরুরী। তবে গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে জরুরী হলো গণতান্ত্রিক মানসিকতা। সামন্তীয় ধ্যানধারণা দিয়ে কোনো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যেমন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা দিয়েও সমাজতন্ত্রকে টেকসই করা যায় না। ভারসাম্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের নির্বাহী, আইনসভা ও বিচার বিভাগের মধ্যে। ভারসাম্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বেও । দল মানেই সমষ্টি, সেটি কোনো দলের শীর্ষ নেতৃত্ব মানেন না।

তথ্য নির্দেশ:

১) প্রথম আলো (২০১৮), ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর।
২) হক, আবুল ফজল, (২০১৪), বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, পৃ: ১৫৭-১৫৯।
৩) হক, সাহাবুল ও আলম, বায়েজীদ, (২০১৪), বাংলাদেশের জোট রাজনীতি,(১৯৫৪-২০১৪), ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, পৃ: ২৫১-২৫৮।
৪) তদেব, পৃ: ২৪৮।
৫) প্রথম আলো (২০১৫), ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি।
৬) প্রথম আলো (২০১৫), ঢাকা, ৩০ এপ্রিল।
৭) নয়া দিগন্ত (২০১৫), ঢাকা, ২৯ এপ্রিল।
৮) নয়া দিগন্ত (২০১৫), ঢাকা, ২৯ এপ্রিল।
৯) নয়া দিগন্ত (২০১৫), ঢাকা, ৩০ এপ্রিল।
১০) প্রথম আলো (২০১৫), ঢাকা, ২৯ এপ্রিল।
১১) প্রথম আলো (২০১৫), ঢাকা, ১ মে।
১২) যুগান্তর (২০১৮), ঢাকা, ১ আগষ্ট।
১৩) বিবিসি, বাংলা (২০১৮), ঢাকা, ৩০ জুলাই।
১৪) প্রথম আলো (২০১৫), ঢাকা, ৩০ এপ্রিল।
১৫) নয়া দিগন্ত (২০১৫), ঢাকা, ৩০ এপ্রিল।
১৬) যুগান্তর (২০১৮), ঢাকা, ১ আগষ্ট।
১৭) হক ,আবুল ফজল, (২০১৪), প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৯ ।
১৮) হক, সাহাবুল ও আলম, বায়েজীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।
১৯) রেজা, মো. শামীম ও অন্যান্য, (২০১৩), বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক উন্নয়ন, ১৯৪৭ থেকে বর্তমান, ঢাকা: আকাশ প্রকাশনী, পৃ: ৪৮২-৪৮৪।
২০) হক ,আবুল ফজল, (২০১৪), প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯১-৩৯৫।
২১) তদেব, পৃ: ৩৮৮-৩৮৯।
২২) তদেব, পৃ: ৩৯১।
২৩) প্রথম আলো (২০১৫), ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারী।
২৪) প্রথম আলো (২০১৫), ঢাকা, ৬ ফেব্রুয়ারী।
২৫) Jahan, Rounaq (2015), POLITICAL PARTIES IN BANGLADESH, Challenges of Democratization, Dhaka: Prathoma, P: 195-196.
২৬) প্রথম আলো (২০১৮), ঢাকা, ২৯ আগষ্ট।
২৭) Jahan, Rounaq (2015), opcit.